

ব্যালেন্স ইউর লাইফ

সফল জীবনের সূত্র ও প্রেসক্রিপশন

মূল

ড. আবদুল করিম বাক্কার

অনুবাদ

এমদাদুল হাসান জায়েদ

সম্পাদনা

মাওলানা সাজ্জাদ হুসাইন

দ্বিজদাহ

পাবলিকেশন



অনুবাদের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد،

ভারসাম্য, ব্যালেন্স কিংবা আরবি শব্দ ‘তাওয়াযুন’-এর অর্থ, বিভিন্ন দিকের ওজনের সমতা। ইসলামে ভারসাম্য, মধ্যপন্থা ও পরিমিতিবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। শরিয়তের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থি থাকার উপায় হচ্ছে শরিয়ি বিধানাবলির যথাযথ অনুসরণ করা।

আপনি শরিয়তের বিশুদ্ধ অনুসরণে যতটা সক্রিয় হবেন, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই ভারসাম্য বজায় রাখতে সমর্থ হবেন। শরিয়তের বিধান স্বভাবতই ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে থাকে।

মানুষের জন্য যা কল্যাণকর, যা মানব-স্বভাবের অনুকূল এবং যা দ্বারা মানবজীবন উপকৃত হবে, শরিয়ি বিধান সে অনুযায়ীই মধ্যপন্থাসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে থাকে। মানুষকে সে অনুপাতেই বিধান দেওয়া হয়েছে। এরই নামই দীন, এরই নাম ইসলাম। ইরশাদ হয়েছে,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

‘তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত করো। অনুসরণ করো আল্লাহর (সৃষ্টি) স্বভাব-প্রকৃতির, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।’ [সূরা রুম, আয়াত ৩০]

মূলত সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি যা কামনা করে, সে অনুযায়ী ইসলামের প্রতিটি বিধানের মান ও পরিমাণ স্থির করা হয়েছে। হালাল-হারাম, ফরজ, ওয়াজিব, মুস্তাহাব ইত্যাদি সে হিসেবেই সাব্যস্ত হয়েছে। আর এমন হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন, বান্দার কল্যাণে কোন বিধানটা কী মান ও কী পরিমাণে দেওয়া প্রয়োজন এবং কোন বিধান তার স্বভাবের উপযোগী হবে ও কী মাত্রায় উপযোগী হবে। প্রতিটি বিধান তিনি সে হিসেবেই দিয়েছেন।

সুনির্দিষ্ট পাঁচটি সময়ে নামাজ ফরজ করা হয়েছে। নামাজের রাকাত সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কত রাকাত ফরজ, কত রাকাত সুন্নাত, তাও স্থির করে দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি রুকু-সিজদার পদ্ধতি ও সংখ্যা এবং কার্যাবলির ধারাবাহিকতা, সবকিছু স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, শরিয়তের প্রতিটি বিষয়ই ভারসাম্যপূর্ণ। না অবহেলা করার মতো লঘুতর, না চাপ বোধ করার মতো গুরুভার।

জাকাতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, জাকাত সুনির্দিষ্ট মালে, নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট হারে ফরজ করা হয়েছে। তা ছাড়া অতিরিক্ত দানকে বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া ঐচ্ছিক পর্যায়ে রাখা হয়েছে। এমনিভাবে রোজা ও হজের মান, পরিমাণ ও প্রাসঙ্গিক সবকিছুই ভারসাম্যপূর্ণ।

কোনোটিতেই কোনো রকম প্রান্তিকতা নেই। বরং প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে মান ও পরিমাণ স্থির করা হয়েছে, তা পরিপূর্ণ মানব-স্বভাবের অনুকূল। এর অতিরিক্ত হলে বেশি চাপ সহ্য করতে হতো। আবার কম হলে বিধান দ্বারা কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া অসম্ভব হতো। মূলত ইসলামের যে বিধান যেভাবে দেওয়া হয়েছে, তা যথাযথ মাত্রায়ুজ্ঞ ও সম্পূর্ণ স্বভাবসম্মত। প্রতিটি বিধান যথাযথ পালন করা হলে তা হবে ইসলামের যথার্থ অনুসরণ।

তখন অতিরঞ্জিত প্রান্তিকতার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে বিদআতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা বাকি থাকবে না। তাই কোন বিধান কী পর্যায়ের তারও পরিষ্কার ধারণা রাখা দরকার। উম্মাহর ফুকাহায়ে কেরামের প্রতি শোকর নিবেদন, তারা ফিকহ-চর্চার মাধ্যমে সে বিষয়টিও আমাদের জন্য সহজ করে দিয়ে গেছেন। জাযাহুমুল্লাহ আলা খাইরাল জাযা!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

‘(দয়াময় আল্লাহর বান্দা তারা) যারা ব্যয় করার সময় অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং (তারা) এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় আছে।’ [সূরা ফুরকান, আয়াত ৬৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَجِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلَّ مُيَسَّرٍ إِلَى قَدَرٍ مِنْهَا.

‘তোমরা দুনিয়া সন্ধানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। (মনে রেখো,) প্রত্যেকের জন্য দুনিয়ার যতটুকু বরাদ্দ, ততটুকুই রাখা হয়েছে (সে কেবল তাই পারে)।’^১

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা যে সারনির্ধাস পাই তা হলো, শরিয়তবিরোধী কোনো ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই প্রান্তিকতার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। তবে ভারসাম্য রক্ষার অর্থ কার্পণ্য করা নয়। ভারসাম্য মানে হলো, পরিমিতিবোধের উপলব্ধি ঘটিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.

‘আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যে নেয়ামত দান করেন, বান্দার মাঝে তার ছাপ দেখতে তিনি পছন্দ করেন।’^২

অন্যদিকে আমরা অনেকেই দায়িত্ব, পারিবারিক ব্যস্ততা ও কর্মব্যস্ততার মাঝে ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন গুলিয়ে ফেলি। এতে বহু মানুষ হক থেকে বঞ্চিত হয় এবং হতাশার জীবন কাটায়। তাই ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই জরুরি। কর্ম ও জীবনকে আলাদা করে নয়, বরং এ দুয়ের সমন্বয়েই সুখী-সমৃদ্ধ জীবন পরিচালনা করা সম্ভব।

১. মুসাদ্দরাকে হাকেম, হাদিস নং ২১৩৩; মুসনাদে বাযযার, হাদিস নং ১৬০২

২. তিরমিজি, হাদিস নং ২৮১৯

কর্ম ও জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। কিছু উপায়ে আমরা এর মাঝে সমতা বিধান করতে পারি। উপায়গুলো হলো :

- ✓ কাজের গুরুত্ব বোঝা।
- ✓ রুটিন তৈরি করা।
- ✓ শরীরের যথাযথ যত্ন নেওয়া।
- ✓ সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝা।
- ✓ বাসায় অফিসের কাজ না করা।
- ✓ নিজ কাজকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া ও নিজের জন্য সময় রাখা।

এই অনুশীলনগুলো করা হলে ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা ও পরিমিতবোধ জাগ্রত হবে ইনশাআল্লাহ। ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন ও পারিবারিক জীবনে কীভাবে আমরা এ ভারসাম্য রক্ষা করতে পারব তা নিয়েই সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এই বইটিতে। লেখক ড. আবদুল করিম বাক্কার ‘আত-তাওয়াযুন’ গ্রন্থে বর্তমান সমাজের বাস্তবতা এবং ইসলামের সম্মানকে যুগ ও প্রজন্মের ভাষায় তুলে ধরেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তার বাংলা সংস্করণ।

এ হলো অনুবাদ বিষয়ে দু'চারটি কথা। এটি আমার প্রকাশের মুখ দেখা প্রথম কোনো কাজ। অনুবাদ দিয়েই যার সূচনা। মেহেরবান আল্লাহ কাজটিকে কবুল করুন। আমাকেসহ সবাইকে উপকৃত করুন। আত্মতৃপ্তি, বদনজর ও হিংসার দু'টি চক্র থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষার সীমাবদ্ধতা ও পরিভাষাগত জটিলতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক কথা। তবুও চেষ্টা করেছি সাবলীলভাবে সরল-প্রাঞ্জল উপস্থাপনার। মূলত মাওলানা ইফতেখার সিফাত ভাইয়ের আত্মপ্রদান ও সাহস যোগদানের ফলই হলো এই অনুবাদকর্মটি। তিনি আমার কাজের গতিপ্রকৃতি দেখে আশ্চর্য ও খুশি হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। তা ছাড়া যেকোনো নির্মাণের পেছনে থাকে বহু মানুষের গল্প। আল্লাহ তাদের উত্তম জাযা দিন।

এখানে একজনের কথা না বললে অন্যায়বোধ হবে, তিনি আমার আশ্রয়। আমি দুদিন হলো ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মেডিকেল ভর্তি থেকে এসেছি। অসুস্থ শরীর নিয়েই কাজ শুরু করেছি। তিনি ছায়ার মতো আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন। রাতদিন যখনই যা প্রয়োজন হয়েছে, আমি টের না পেলেও তিনি টের পেতেন। আমার

পূর্ণাঙ্গ কাজটিতে তার স্নেহ-ছায়া বিদ্যমান। রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।

পাঠক, এই অনুবাদকর্মের যা কিছু বিচ্যুতি, এর দায়ভার আমার। আর যা কিছু ভালো, তা রবের ইহসান ও কিছু ভাইয়ের আন্তরিক অংশগ্রহণ। এই অবকাশে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তবে মানুষ ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয়, যেকোনো ভুল নজরে পড়লে আমাদের জানাবেন। আমরা সংশোধনের জন্য সহাস্য প্রস্তুত।

পরিশেষে, ভারসাম্য আমাদের একটি সুন্দর জীবনের ভিত্তি হোক—এই প্রত্যাশা।
মাআস সালাম।

এমদাদুল হাসান জায়েদ

দারে আলি

৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরি

৭ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঈসাব্দ

রাত ০৩ : ১৫, শনিবার



সূচিপত্র

ভূমিকা	১৫
ভারসাম্য কী?	১৮
১. সঠিক জ্ঞান ও স্পষ্ট উপলব্ধি	২০
২. দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি ও সুস্থ বিবেকবোধ	২০
৩. দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম	২১
বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্য	২২
বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যালেন্স	২৩
বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্যের উপাদান	২৩
১. সঠিক উপলব্ধি থাকা	২৩
২. বাস্তবতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার পার্থক্য	২৪
৩. জেনারাইলেশন এড়িয়ে চলা	২৫
৪. মানুষের জ্ঞানার পরিধি খুবই সামান্য	২৭
৫. প্রবৃত্তি ও চাহিদার উপাদান	২৮
মনস্তাত্ত্বিক ব্যালেন্স	৩৩
মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্যের উপাদান	৩৪
১. যৌক্তিক চিন্তা	৩৪
২. ব্যাপক দৃষ্টিকোণ	৩৫
৩. দীনদারিতার সাথে বাহ্যিক বেশভূষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা	৩৬
৪. বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া	৩৭
৫. আকর্ষণ-বিকর্ষণ	৩৮

৬. চূড়ান্ত লক্ষ্যের উজ্জ্বলতা	৩৯
৭. আশা ও খুশি প্রকাশ	৩৯
৮. সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা	৪২
ইহকাল ও পরকালের মধ্যকার ব্যালেন্স	৪৪
দীন ও দুনিয়ার মধ্যকার ভারসাম্য	৪৫
ইহকাল ও পরকালের মধ্যকার ভারসাম্যের উপাদান	৪৫
১. দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র	৪৫
২. নেক নিয়ত	৪৬
৩. উপায় বা মাধ্যম গ্রহণ করা	৪৮
৪. কর্তব্য ও উদ্দেশ্য	৪৯
৫. ইবাদাতে ভারসাম্য রক্ষা করা	৫০
পেশা ও পরিবারের মাঝে ব্যালেন্স	৫৪
পেশা ও পরিবারের মাঝে ভারসাম্যের উপাদান	৫৫
পরিবার ও কর্মের মধ্যে ব্যালেন্স করার উপায়	৫৬
১. সীমাবদ্ধতার উপলব্ধি	৫৬
২. পরিস্থিতি বোঝা	৫৭
৩. দুটি পরিবেশের ভিন্নতা	৫৭
৪. কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৫৮
৫. কাজ সম্পূর্ণ করার পদ্ধতি	৫৮
৬. ব্যক্তিগত জীবনের পরিকল্পনা	৫৮
৭. বাড়ির পরিবেশ	৫৯
৮. ছুটির নির্ধারিত সময়গুলো	৫৯
৯. যোগাযোগের মাধ্যম	৬০
১০. ছোট ছোট ছুটি	৬০
১১. কাছাকাছি কাজ নেওয়া	৬০
১২. ছোটখাটো উপহার	৬০
চিন্তা ও আবেগের মধ্যে ব্যালেন্স	৬২
চিন্তা ও আবেগের ভারসাম্য	৬৩
১. মনন ও চিন্তা	৬৩
২. চিন্তা ও আবেগের সম্পর্কের সারমর্ম	৬৪

৩. চিন্তাভাবনা ও আবেগের ভারসাম্য	৬৭
ক. মানসিক উদারতা	৬৭
খ. মানসিক চিত্র পর্যবেক্ষণ	৬৭
গ. পরামর্শ	৬৮
ঘ. কল্যাণ বিবেচনা করা	৬৮
ঙ. নিরপেক্ষতার মায়া থেকে মুক্তি পাওয়া	৬৯
চ. জ্ঞান হলো মনের সৈনিক	৭০
ছ. অন্যদের বুঝতে পারা	৭০
জ. স্থায়ী স্বাধীনতা	৭১
আত্মসচেতনতায় ব্যালেন্স	৭২
আত্মসচেতনতায় ভারসাম্য	৭৩
১. সাধারণ জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞানের মধ্যকার ব্যালেন্স	৭৪
২. পদ্ধতি ও উপ-তথ্যের মধ্যে ব্যালেন্স	৭৬
৩. বর্ণনা ও জ্ঞানের মধ্যকার ব্যালেন্স	৭৯
ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য	৮৩
ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য	৮৪
বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য	৮৪
অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য	৮৫
ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্যের উপাদান	৮৬
১. আমাদের ব্যক্তিগত জীবনই মূল ভিত্তি	৮৬
২. সময়ের পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নয়	৮৭
৩. সামগ্রিক চিত্র নির্ধারণ করা	৮৮
গ্রন্থপঞ্জি	৯৩



ভারসাম্য কী?

ভারসাম্য কিংবা ব্যালেন্স একই অর্থ নির্দেশ করে। যখন দেহের ভেতরের সঞ্চারিত শক্তি স্বাভাবিক থাকে, তখন দেহে শারীরিক ভারসাম্য বিদ্যমান থাকে। দেহের মধ্যকার শক্তি সঞ্চারণের ফল হয় শূন্যের সমান। অর্থাৎ শক্তি থাকা না থাকা সমান। এ কারণেই ভিন্ন কোনো শক্তি এটিকে আকর্ষণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাই তা ভারসাম্যপূর্ণ হয় এবং আপন অবস্থায় স্থির থাকে।

অর্থনৈতিক ব্যালেন্স মানে দেশের আমদানি ও রপ্তানি সমান। অর্থাৎ অর্থনীতি সমৃদ্ধি ও উন্নতির মাঝখানে এবং অবনতি ও ব্যর্থতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আর রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য মানে সমতা। যেখানে একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। এই সমস্ত কিছুর মূলকথা হলো, ভারসাম্য বলতে বোঝায় দুটি সমান জিনিসের অস্তিত্ব, অথবা এমন জিনিস যা ভিন্ন বা অসংগতিপূর্ণ, কিন্তু আকার, ক্ষেত্রফল বা প্রভাবে সমান। একটি অপরটির অস্তিত্বকে শূন্য ও অকার্যকর করে দেয়।

আমরা এই আশা করি না যে, দুটি পারমাণবিক রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হোক। কারণ এর অর্থ হবে, তাদের প্রত্যেকের জন্য ব্যাপক ধ্বংস বিস্তার। পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী সমস্ত দেশ ক্রমাগত প্রচলিত অস্ত্র বিকাশ করছে। কারণ তারা বিশ্বাস করে তাদের পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার সম্ভব হয়ে উঠবে না। এভাবেই এর ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং ধীরে ধীরে তা নিঃশেষ হয়ে যায়।

নৈতিক বিষয়ে ভারসাম্য অর্জন করা সংবেদনশীল ও বস্তুগত বিষয়ে ভারসাম্য অর্জনের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। তা সর্বদা মনোবলের সাথে লেনদেনের

অসুবিধার প্রাক্কালে প্রকাশ পায়। কারণ তা পরিষ্কারভাবে বোধগম্য নয়। যখন আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ও আচরণে চিন্তাভাবনা এবং আবেগের মধ্যকার ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচনা করি, তখন আমরা দুটি অস্পষ্ট জিনিসের মাঝে মোকাবিলা করার বিষয়ে কথা বলি। নীতি ও স্বার্থের মধ্যকার ভারসাম্য এবং ব্যক্তিজীবন ও জনজীবনের মধ্যকার ভারসাম্যের বিষয়টি একই রকম।

আমাদের ভারসাম্যের সারমর্ম ঠিকভাবে বুঝতে হলে আগে ‘চরমপস্থা’ কী, তা বোঝা

জরুরি।

কারণ অনেক সময় কোনো কিছু চরমপস্থার মানদণ্ডে বিচার করা হয় আপেক্ষিকভাবে—তা সবসময় সুসংহত বা নির্দিষ্ট নয়। চরমপস্থা পরিস্থিতি ও সামাজিক প্রথার ওপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একজন মানুষের এক মিলিয়ন টাকা আছে। তিনি যদি প্রতি মাসে বিশ হাজার টাকা খরচ করেন, তাহলে আমরা বলি—তিনি ব্যয়ের দিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ।

কিন্তু এই ব্যয়ের ভারসাম্য আসলে নির্ভর করে—

- সেই ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থান,
- তাঁর পরিবেশ,
- এবং সমাজে তাঁর অবস্থান কোথায়—তার ওপর।

অর্থাৎ বাস্তব জীবনে যেটাকে আমরা ‘ভারসাম্য’ বলি, সেটার মানদণ্ড একরকম নয়—এটি প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভিন্ন হয়। তবুও আমরা চেষ্টা করি,

- নিজের সীমাবদ্ধতাকে বুঝে চলতে,
- দায়িত্বশীলভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে,
- এবং নিজের অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারসাম্য বজায় রাখতে।

এখানে এসে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে, তা হলো—ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রত্যেকের কী প্রয়োজন?

প্রাথমিকভাবে আমি বলতে পারি, সত্যিকারের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তির জন্য তিনটি মৌলিক জিনিস প্রয়োজন :

১. সঠিক জ্ঞান ও স্পষ্ট উপলব্ধি

একজন ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য আগে জানতে হবে, ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান, আচরণ ও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য কী? এটি কেবল তখনই সম্ভব, যখন মানুষ সেই বিষয়গুলোকে চিনে নেয়, যেগুলো ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের মানদণ্ড গঠন করে।

যেমন আমরা যদি কাউকে বলি, আপনাকে আপনার রবের হক, নিজের হক ও পরিবারের হক যথাযথভাবে আদায় করতে হবে, তাহলে তার আগে জানতে হবে :

- ✓ আল্লাহর হক কী?
- ✓ নিজের প্রতি দায়িত্ব কী?
- ✓ পরিবারের অধিকার কী?

তাহলেই সে সবার হক যথাস্থানে দিতে পারবে এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে। কিন্তু বেদনাদায়ক সত্য হলো, এই মৌলিক উপলব্ধির জায়গায় আজও অনেক মানুষের চরম দুর্বলতা রয়েছে।

২. দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি ও সুস্থ বিবেকবোধ

একজন ভারসাম্যপূর্ণ মানুষের মধ্যে তিনটি জিনিস থাকতে হয়

- ✓ পরিণত মনস্তত্ত্ববোধ।
- ✓ ব্যাপক ও স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি।
- ✓ দুনিয়া ও আখিরাতের ভারসাম্যপূর্ণ মূল্যায়ন।

অনেকেই দুনিয়ার প্রতি এত আসক্ত হয়ে পড়ে যে, আখিরাতের কথা ভুলেই যায়। আবার এ কথাও মনে করে যে, ‘আমি দুনিয়াকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি, আবার আখিরাতের জন্যও প্রচুর আমল করছি’! আসলে তাদের আচরণে ভারসাম্য অনুপস্থিত।

কারণ?

ভারসাম্য একটি এককালীন সিদ্ধান্ত নয়। এটি একটি ধারাবাহিক মানসিক সচেতনতা, যা মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের পথনির্দেশ করে।

উদাহরণ,

কোনো ব্যক্তি তার বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘ নৈশআলাপ ও আড্ডায় সময় কাটায়, একপর্যায়ে এ আড্ডা মধ্যরাত ছুঁয়ে ফেলে এবং ফজরের নামাজের ব্যাঘাত ঘটানোর উপক্রম হয়, তখন একজন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে এবং থেমে যায়। সে বুঝতে পারে, এখানে আনন্দ ও ইবাদতের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

৩. দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

অনেক সময় মানুষ জানে, কী করলে ভারসাম্য বজায় থাকবে, কী করলে সে ইনসাফ ও ন্যায়ের পথে থাকবে। কিন্তু তারপরও সে পারে না। কেন? কারণ প্রবৃত্তি ও মনোবাসনার টান তাকে বেঁধে রাখে। সে জানে সোজা চলা উচিত, কিন্তু সে ডানে-বামে ঝুঁকে পড়ে। তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নিজস্ব লালসা ও তৃষ্ণা। এখানেই প্রয়োজন হয় মুজাহাদার, প্রয়োজন হয় নিজ নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُبُلَنَا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنَ الْمُحْسِنِينَ.

‘যারা আমার পথে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালায় তাদেরকে আমি অবশ্যই অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে আছেন।’ [সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯]

ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সাথে কিছুটা কঠিনও। আল্লাহর ইচ্ছায় পরবর্তী আলোচনাগুলোতে এ বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দীন ও দুনিয়ার মধ্যকার ভারসাম্য

আমরা যখন ভারসাম্য নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমাদের লক্ষ্য থাকে, একজন মানুষের ভেতরে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। এমন ব্যক্তিত্ব, যেখানে তার চিন্তা, আচরণ ও অবস্থান—সবকিছুতেই ভারসাম্য থাকে।

একজন মুসলিমের জন্য দুটি দিকের ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- ✓ দুনিয়ায় সঠিকভাবে জীবনযাপন করার ভারসাম্য।
- ✓ পরকালে সফল হওয়ার জন্য আমলের ভারসাম্য।

যদি কেউ এ ভারসাম্যকে উপেক্ষা করে চলে, তাহলে তা হয়তো দুনিয়ায়, নাইয় পরকালে, আর কখনো কখনো উভয় জগতেই কষ্ট ও ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অনেক লোক মনে করে পরকাল দুনিয়ার বিপরীত। কারণ তারা মনে করে, কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই পৃথিবী উপভোগ করা এবং পরকালে জান্নাত লাভের জন্য আমল করার পাশাপাশি উত্তম জীবনযাপন করা কঠিন। এই কারণে অনেক মানুষ দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকছে এবং আখিরাতের বিষয়কে অবহেলা করছে। আর কতক মানুষ আখিরাতের দিকে ঝুঁকছে এবং দুনিয়ার বিষয়গুলোকে অবহেলা করছে। ফলে তারা কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং নিজ স্ত্রী ও সন্তানসহ তার চারপাশের লোকদের দুঃখের অনুভূতি দিয়ে বেড়ায়। মূলত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাদের বুঝের অভাবের কারণেই এসব হয়ে থাকে।

ইহকাল ও পরকালের মধ্যকার ভারসাম্যের উপাদান

১. দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র

একজন মুসলিমের দৃষ্টিতে জীবন দুটি অধ্যায়ের মতো। প্রথমটি খুব ছোট অধ্যায়। তা হলো পার্থিব জীবনের অধ্যায়। এটি বীজ বপন, পেশা, আদান-প্রদান ও পরীক্ষার একটি অধ্যায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় অধ্যায় দীর্ঘতম ও গুরুত্বপূর্ণ। তা

পরকাল জগতের অধ্যায়, ফসল কাটা, ফল সংগ্রহ করা ও ফলাফল লাভের অধ্যায়।

এর অর্থ হলো, দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে সংহতি ও সম্প্রীতির অস্তিত্বের প্রয়োজন। দুনিয়াতে বসবাসের অর্থ আখিরাতকে ভুলে যাওয়া নয়। আর পরকালে সুখের জন্য প্রচেষ্টা করার অর্থ এই পৃথিবীতে দুঃখে থাকা নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ.

‘আল্লাহ তোমাকে যা-কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখিরাতের নিবাস লাভের চেষ্টা করো এবং দুনিয়া হতেও নিজ অংশ অগ্রাহ্য করো না। আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও (অন্যদের প্রতি) অনুগ্রহ করো।’ [সূরা কাসাস, আয়াত ৭৭]

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘আল্লাহ দুনিয়ার যে সকল জিনিস বান্দার জন্য বৈধ করেছেন, তাতেই বান্দার স্বাচ্ছন্দ্য ও পূর্ণতা নিহিত আছে।’

মুসলিম তার পার্থিব জীবনকে জায়েজের পরিধির ভেতরে থেকে উপভোগ করে। আর এই পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। কারণ এই জাতির ওপর আল্লাহর একটি অনুগ্রহ হলো, এ ধর্মে এমন কিছু নেই, যা বিশ্বাস করা অযৌক্তিক বা পালন করা অসাধ্য।

২. নেক নিয়ত

একজন মুসলমান খাওয়া, ঘুমানো, ব্যায়াম করা, বিয়ে করা, অতিথি ও ভাইদের সম্মান ও আপ্যায়ন করাসহ অনেক সাধারণ কাজই করতে পারে। এসব কাজের মাধ্যমে সে চাইলেই আল্লাহ তাআলার কাছে পুরস্কৃত হতে পারে। অর্থাৎ একজন মুসলিম এমন অনেক কিছুই করতে পারে, যা তাকে দুনিয়াতে সুখী করে এবং আখিরাতে সাওয়াব ও প্রতিদান এনে দেয়। শর্ত হলো ‘নেক নিয়ত’। যদি এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে সেসব আমলও ইবাদতের মর্যাদা পায়।

পেশা ও পরিবারের মাঝে ভারসাম্যের উপাদান

শুরুতেই স্বীকার করে নিচ্ছি, আমাদের পেশা ও পারিবারিক জীবনকে সফলভাবে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট হিমশিম খাই। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আমরা একধরনের চক্রে আবদ্ধ হয়ে আছি এবং এর কারণ হলো অস্বাভাবিক রকমের চাপ। যা আমাদের জীবনের প্রতিটি দিকেই প্রভাব বিস্তার করে আছে। পেশা ও পরিবারে আমাদের সুস্পষ্ট ভূমিকা ও শৃঙ্খলার অভাবেই এ সংকট আমাদের মধ্যে প্রকটভাবে বিদ্যমান থাকে। আমি মনে করি, এ বিষয়ে আলোচনা করলে আমাদের সংকটের জায়গাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আমাদের প্রয়োজন হলো পারিবারিক জীবনে সফল হওয়া এবং এর উষ্ণতা উপভোগ করা। এবং একই সাথে আমাদের ব্যবসা ও জীবিকার উৎসগুলোতেও সাফল্যের প্রয়োজন। কারণ এ ক্ষেত্রে সফলতা আধ্যাত্মিক, মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজনের আহ্বান করে।

সমস্যা হলো আমরা পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাফল্যের সীমা জানি না। এখানে বিষয়গুলো অস্পষ্ট এবং অনেকাংশে আপেক্ষিক। এই অস্পষ্টতা ও কাজের চাপের কারণে সমস্যাটি আরও বেড়ে যায়। কারণ আমাদের কাজের সময় খুব বেশি। যেমনটি কর্মস্থলে কর্মরত অনেক ডাক্তার ও প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে হয় বা কাজের প্রকৃতির কারণে হয়। আমাদের এখানে ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, অসংগঠিত কাজের পরিবেশ এবং অনমনীয় ও অসহযোগী পরিচালকদের নেতৃত্বে কাজের পরিবেশ ও কাজের প্রকৃতি জানার জন্য দীর্ঘ ভ্রমণের প্রয়োজন। এসবের উদ্দেশ্য হলো এই অনুভূতি—কোনো ব্যক্তি মনে করছে, সে যেই পোস্টে কাজ করছে সেই পোস্ট দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কারণে বা বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে তার চাকরি হুমকির সম্মুখীন রয়েছে!

স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আমাদের একটি বড় সমস্যা রয়েছে, যা আমাদের পারিবারিক জীবনে নেতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলে। সেই সমস্যাটি হলো ‘কাজের প্রতি আসক্তি’। যেমন ধরুন, একজন ব্যক্তি প্রমোশনের জন্য নিজের ওপর

বাড়তি কাজ বা ওভারটাইম চাপিয়ে নেয়, যা তার মানসিক স্বাস্থ্য, সময় ও আর্থহকে ক্ষয় করে ফেলে। ফলে পারিবারিক বিষয়গুলো উপেক্ষিত হয় আর সামাজিক সম্পর্কগুলো একপেশে হয়ে যায়।

কখনো কখনো চাকরির প্রতি আসক্তি এমন মাত্রায় পৌঁছে যায় যে, মানুষ এমন কোনো কাজ খুঁজতে থাকে যা মূলত চাকরি-জাতীয়, যদিও সে জানে সেটি অপ্রয়োজনীয় বা ফলহীন। কারণ তার কাছে চাকরিটাই একমাত্র শান্তিদায়ক আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে অনুপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ আমাদের কর্মজীবনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এতে ঘনঘন কাজে অনুপস্থিতি ছাড়াও দুর্বল মনস্তাত্ত্বিক ফিটনেস, কর্মক্ষমতা ও প্রমোশন নিয়ম স্তরে নেমে যায়। তা সবচেয়ে বেশি ঘটার কারণ হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, খুব ছোট বাড়িতে থাকা, ছোট বাচ্চাদের দায়িত্ব নেওয়া এবং বয়স্ক ব্যক্তির দায়িত্ব বহন করা।

নতুন সহস্রাব্দে পরিবারের অনেক সদস্য এখন চাকরি করে। ফলে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা এবং কাজের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সফলভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন ও ব্যর্থ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

পরিবার ও কর্মের মধ্যে ব্যালেন্স করার উপায়

১. সীমাবদ্ধতার উপলব্ধি

পরিবার ও চাকরি উভয়টিতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর নয়। কারণ দুটি অবস্থার একটি প্রকৃতপক্ষে অন্যটিকে গ্রাস করে ফেলে। তাই এর মধ্যে ব্যালেন্স করার জন্য কোনো একটির পক্ষ থেকে অন্যটির সাফল্যের লক্ষ্যে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমরা তাদের মধ্যে যতই ভারসাম্য স্থাপন করি না কেন, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সেগুলো অসম্পূর্ণ ভারসাম্য। এই স্বীকৃতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমরা এই বিষয়ে আমাদের ত্রুটিগুলো সময়ে সময়ে সংশোধন করতে পারি। এর বিকল্প হলো ক্রমাগত আত্মনিন্দা, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না!